বাংলা পুঁথি সম্পাদনা : আদর্শ পাঠের সন্ধানে

বিশ্বনাথ রায়

এক

হানিফ গোপ-এর রহস্য

প্রাচীন 'পুঁথি' নির্ভর সাহিত্যের মুদ্রিত টেক্স্ট যে কি মারাত্মক ও বিচিত্র সংকট তৈরি করে তার একটা কৌতূহলজনক দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। কুড়ি বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় (ভাদ্র ১২৮৭) 'বাঙ্গালী কবি নয়' প্রবন্ধে মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' কাব্যের অসংগতির সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন :

> ...কালকেতু নামে এক দুঃখী ব্যাধ কোন দিন বা খাইতে পায় কোন দিন বা খাইতে পায় না। যেদিন খাইতে পায়, সেদিন সে চারি হাঁড়ি ক্ষুদ, ছয় হাঁড়ি দাল ও ঝুড়ি দুই তিন আলু ওল পোড়া খায়। ...এই ব্যক্তি চণ্ডীর প্রসাদে রাজত্ব পায়। কিন্তু তাহার রাজসভায় ও একটি ছোটোখাট জমিদারী কাছারীতে প্রভেদ কিছুই নাই। তাহার রাজত্বে *হানিফ গোপ* ক্ষেতে শস্য উৎপন্ন করে; ভাঁড়ু দত্ত বলিয়া এক মোড়ল আসিয়াছে; তাঁহার 'ফোটা কাটা মহাদম্ভ, ছেঁড়া যোড়া কোঁচা লম্ব/শ্রবণে কলম খরশান।'[১]

'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'র এই বিবরণে পাঠান্তর নিয়ে দু'একটি ছোটোখাটো অসংগতি (যেমন 'মোড়া'র পরিবর্তে কোনো কোনো পুঁথিতে আছে 'ধুতি', কিন্তু তাতে অর্থের বিশেষ ফারাক হয় না) থাকলেও তাতে মূল বিষয়ের তেমন হেরফের ঘটে না। কিন্তু একালের একনিষ্ঠ রবীন্দ্র-রচনার পাঠক যদি ক্ষেতে শস্য উৎপাদনকারী *হানিফ গোপ* নামক চরিত্রটিকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে খুঁজতে যান তো হতাশ হবেন। কেননা গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' কাব্যের যে ক'টি নির্ভরযোগ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তাতে 'হানিফ গোপ'-এর কোনো অস্তিত্ব নেই। রবীন্দ্রনাথ তাহলে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ নাম-পদবি যুক্ত এই চরিত্রটি পেলেন কোথায়? 'হানিফ' কোনো হিন্দুর নাম হতে পারে

না; আবার 'গোপ' এই জাতি বা সম্প্রদায়গত পদবি একান্তই হিন্দুর। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কয়েক শত চরিত্র নামের[৫] মধ্যে হানিফ গোপ এক মস্ত জিজ্ঞাসা।

এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর নগর পত্তন ও প্রজা সংস্থাপনের অংশবিশেষ নাড়াচাড়া করে প্রচলিত বিভিন্ন সংস্করণে যা পাওয়া গেল তা এইরূপ :

১. বসুমতী সংস্করণ ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীর বহুল প্রচলিত সংস্করণে আছে :

নিবসে *বণিক গোপ* না জানে কপট কোপ
ক্ষেতে উপজায় নানাধন।
মুগ তিল গুড় মাসে গম সরিষা কাপাসে
সবার পূর্ণিত নিকেতন।।

(বণিক ও নব শায়কদিগের আগমন)

২. ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত সাহিত্য অকাদেমি সংস্করণে পাই :

নিবসে *হলিক গোপ* না জানে কপট কোপ
খেতে উপজায় নানা ধন।

(—অধ্যায় ১৩৫)

ড. সেন পাঠান্তরে 'সদ্‌গোপ' দেখিয়েছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে লিপিকৃত ১০৮৬ সংখ্যক পুঁথি থেকে।

৩. ড. ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'র সংস্করণে পাওয়া যায় :

নিবসে *আহীরি গোপ* না জানে কপট কোপ
খেতে উপজায় নানা ধন।

(—শাখা সম্প্রদায়ের বসতি)

পাদটীকায় ড. দাস জানিয়েছেন 'আহীরি গোপ' অর্থাৎ সদ্‌গোপ, কৃষিজীবী'। 'আহীরি গোপ' পাঠ ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'চণ্ডীমঙ্গল' (১৯৯২) গ্রন্থেও পাই।

৪. ড. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দের 'অভয়ামঙ্গল'/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য সম্বলিত সংস্করণটিতে দুটি পাঠ আমরা পাই :

ক. ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গবাসী দ্বিতীয় সংস্করণে আছে

নিবসে *বণিক গোপ* না জানে কপট কোপ
ক্ষেতে উপজায় নানা ধন।

খ. দ্বিতীয় পাঠটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত ১২২৫ বঙ্গাব্দে (১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ) লিপিকৃত বীরভূম অঞ্চলের একটি পুঁথির। তাতে পাই—

নিবসে *হলিক গোপ* না জানে কপট কোপ
ক্ষেতে উপজ-এ নানা ধন।

এ ছাড়াও ড. সনৎকুমার নস্কর ও ড. সন্দীপকুমার মণ্ডল তাঁদের গ্রন্থে পূর্বোক্ত বঙ্গবাসী সংস্করণের পাঠটিকেই গ্রহণ করেছেন—

'নিবসে বণিক গোপ : না জানে কপট কোপ'।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত ১০৯৩ সংখ্যক পুঁথিতে একটি অদ্ভুত পাঠ পাওয়া যায়—'নিবসে *ইনিত গোপ*'। বিংশ শতাব্দীর কোনো সংস্করণেই রবীন্দ্রনাথ কথিত 'হানিফ গোপ'কে পাওয়া গেল না। একেবারে পাওয়া গেল না বললে ভুল হবে। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণে পাওয়া গেল নামটির সামান্য ভিন্ন রূপ—

নিবসে *হনীফ গোপ*।

বোঝা যায় 'হানিফ' পাঠান্তরে 'হনীফ' হয়েছে।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর উনিশ শতকীয় সংস্করণগুলির বেশিরভাগ দুষ্প্রাপ্য। রবীন্দ্রনাথের মুকুন্দ-চর্চার ইতিহাস অন্বেষণ করে জানা গেছে প্রথম যৌবনে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের যে সংস্করণটি তিনি অনুপুঙ্খ পাঠ করেছিলেন তা হল ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত ৮০০ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ গ্রন্থ।[৪] সম্প্রতি তার একটি কপি আকস্মিকভাবে উদ্ধার হওয়ায় নিরুদ্দিষ্ট 'হানিফ গোপ'-এর সন্ধান পেয়েছি আমরা। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীর উক্ত সংস্করণের পৃষ্ঠা ২২৮-২২৯-এ আছে :

নিবসে *হানিফ গোপ* না জানে কপট কোপ
ক্ষেতে উপজয়ে নানা ধন।
গোম তিল মুগ মাস বুট সর্ষপ কাপাস
সবার পূরিত নিকেতন।

মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের একটি পুঁথির 'Text'ই 'হানিফ গোপ'কে একটি চরিত্রে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু তরুণ রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেননি 'নগর পত্তন'-এর এই অনুচ্ছেদটিতে মুকুন্দ 'নব শায়ক' বা ন'টি শাখা সম্প্রদায়ের বসতির কথা বলেছেন। অর্থাৎ কর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন জাতির উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো বিশেষ জাতির ব্যক্তি নাম নয়। কেননা অক্ষয়চন্দ্র সরকারের উক্ত সংস্করণে পরের ছত্রগুলিতে যথাক্রমে তেলি, কামার,

তাম্বুলী, কুম্ভকার, তন্তুবায়, মালি, বারুই ও নাপিত—এই আট জাতির কর্ম বিবরণ আছে। আর প্রথমটিতো কৃষকের কথা। বিশ শতকের সংস্করণগুলিতেও বিভিন্ন জাতির (শাখার) কর্ম বৈশিষ্ট্য ও বিবরণের কথা পাই। সুতরাং অক্ষয়চন্দ্র সরকার ব্যবহৃত পুঁথির 'হানিফ গোপ' কিংবা দীনেশচন্দ্র সেন-এর 'হনিফ গোপ' পাঠ যথাযথ নয়।

এবারে দেখা যেতে পারে কোন্ পাঠটি সঠিক হওয়া সম্ভব। ১নম্বর পাঠ অর্থাৎ 'বণিক গোপ' সঠিক নয়। কেননা 'বণিক' ও 'গোপ' এই দুইকে জাতি হিসাবে ধরলে, বণিকের ক্ষেত্রে অন্তত পরের অংশ 'জানে কপট কোপ' কথাটি আসে না। যেহেতু ইতিপূর্বেই কাব্যে প্রমাণিত হয়ে গেছে মুরারি শীল বণিক এবং সে 'কপট'।

ড. ক্ষুদিরাম দাস ও ড. পঞ্চানন মণ্ডল গৃহীত পাঠটিও যথাযথ নয়। কেননা 'আহীরি গোপ' বলে কিছু বোঝায় না। দুটোই সমার্থক শব্দ। সংস্কৃত 'আভীরী'>আহীরী>আহীরি হয়েছে। আহীর বলতে গোপ জাতিকেই বোঝায়। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে আভীর পল্লী বলতে গোপ পল্লীকেই বুঝিয়েছে। যদিও ড. দাস এই শব্দের পাদটীকায় লিখেছেন—"আহীরি গোপ অর্থাৎ সদ্‌গোপ, কৃষিজীবী'।[৫] কোনো কোনো পুঁথিতে 'নিবসে সদ্‌গোপ' পাঠও পাওয়া যায়। সুকুমার সেন সম্পাদিত 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর সংস্করণে পাঠান্তরে 'সদ্‌গোপ' ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে লিপিকৃত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৮৬ সংখ্যক পুঁথি থেকে পাওয়া। অভিধানেও আছে 'সদ্‌গোপ' হল 'নবশায়ক বিশেষ'। সুতরাং সদ্‌গোপ পাঠ গৃহীত হতে পারে। কিন্তু তার ফলে পঙ্‌ক্তিটিতে ছন্দপতন হয়।

বাকি থাকল দেবনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত চণ্ডীমঙ্গলের সংস্করণে ধৃত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথির পাঠ এবং সুকুমার সেন সম্পাদিত সাহিত্য আকাদেমি সংস্করণের পাঠ। দুটি ক্ষেত্রেই যে পাঠ পাওয়া যাচ্ছে তা হল—'নিবসে *হলিক গোপ*/না জানে কপট কোপ।' আমাদের অনুসন্ধান-জনিত সিদ্ধান্ত এই 'হলিক গোপ' পাঠই সঠিক। কেননা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ জানাচ্ছেন 'হালিক' মানে কৃষক (হল কর্ষণ করে যে?)। উক্ত অভিধানে আছে—'হলিক পুং [হল+ইক (ধন)] কৃষক। তু. 'হালিক'। মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলায় কৈবর্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে দুটি ভাগ দেখা যায়। ১. হেলে কৈবর্ত ২. জেলে কৈবর্ত। হেলে কৈবর্ত অর্থাৎ যে হাল দেয় বা কৃষি কাজ করে। 'হেলে' শব্দটি এসেছে 'হলিক' বা 'হালিক' থেকে। জেলে কৈবর্ত জাল দেয়, পেশায় মৎস্যজীবী।

প্রাচীন বাংলা পুঁথিতে 'ল' এবং 'ন'-এর তফাত করা মাঝে মধ্যেই মুশকিল হয়ে পড়ে বর্ণ দুটি অনেকটা একই রকমের দেখতে হওয়ায়। অক্ষর সাদৃশ্য-জনিত কারণে

লিপিকর প্রমাদে ল>ন-এ পরিণত হয়ে এবং ক>ফ-এ রূপান্তরিত হয়ে 'হলিক' থেকে 'হানিফ' ও 'হালিক' থেকে 'হানিফ' হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। মুদ্রণের সময় পুঁথি 'কপি' করতে গিয়েও এই বিভ্রাট হয়ে থাকতে পারে প্রাচীন লিপি সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার জেরে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ উল্লেখিত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত চণ্ডীমঙ্গলে ধৃত 'হানিফ গোপ' পাঠটি আসলে 'হালিক গোপ' অর্থাৎ গোপ জাতির মধ্যে যারা কৃষিকাজ করে কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁদেরই বোঝাতে চেয়েছেন এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডী কাব্যে কালকেতুর নগর পত্তন-এ জাত-কর্ম অনুযায়ী নবশাখ-এর কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই 'হলিক গোপ' বা 'হালিক গোপ'দের উল্লেখ করেছেন। সুতরাং সুকুমার সেন ও দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-ধৃত পুঁথির পাঠই সঠিক।

দুই

টেন্টণ পা-এর গান বিরলে বোঝে

এখনও পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এমন একটি পুঁথিও পাওয়া যায়নি যা স্বয়ং কবির লেখা। কবির নিজের হস্তাক্ষরের পাণ্ডুলিপি প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিরল। যা পাওয়া গেছে সবই লিপিকরদের করা অনুলিপি। আর এই কারণেই 'আদর্শ পুঁথি' কথাটি একালে বাতিল হয়ে গেছে। অনুলিপির অনুলিপি, তস্য অনুলিপি যেখানে বাংলা পুঁথির বৈশিষ্ট্য, সেখানে 'সাত নকলে আসল খাস্তা'র মধ্যে আদর্শ পুঁথি অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতোই।

আর একারণেই 'যৎ দৃশ্যং-তৎ পঠিতং-বা 'তৎ লিখিতং' পুঁথি সম্পাদনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে যায়। লিপিকর বা পুঁথি পাঠকের (এখানে Reader) জ্ঞানগম্যি অনেকটাই সহায়তা করে পুঁথির যথার্থ পাঠ নির্ণয়ে। অর্থাৎ কবি কী লিখেছিলেন বা কী লিখে থাকতে পারেন সেই সম্ভাব্য 'পাঠ'-এর দিকে যাত্রাই যথার্থ সম্পাদনা। সেখানে সেকালের লিপিকর বা একালের পুঁথি পাঠক ও সম্পাদকের 'প্রত্যাশা' ও 'প্রাপ্তি'র মধ্যে মিলন হওয়াটাই জরুরি। তা না হলে অর্থহীন শব্দমালার অচল পাঠ গ্রাস করবে সম্পাদনার যাবতীয় পরিশ্রমকে। এর দৃষ্টান্ত আছে চর্যাগীতির সম্পাদনায়।

পুঁথি পাঠকের জ্ঞানগম্যি, একালের Reader response-এর তাত্ত্বিক পরিভাষায় 'stock response' কীভাবে সম্ভাব্য শুদ্ধ পাঠ আবিষ্কারে সাহায্য করে ড. নির্মল দাশ চর্যাগীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের পাঠ নির্ণয়ে তা দেখিয়েছেন।

'চর্যাগীতি'র প্রাচীন পুঁথি দেখার জন্য এখন আর নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগারে ছুটতে হয় না। ড. নীলরতন সেন-এর কল্যাণে সেই পুঁথির ফটোকপি* এখন আমাদের

হাতের নাগালের মধ্যে। বাংলায় লেখা 'চর্যাচর্য টীকা'র একটি মাত্র পুঁথিই আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। কিন্তু ওই একটি মাত্র পুঁথিকে অনুশীলন করেই চর্যাগানের অজস্র পাঠান্তর দেখিয়েছেন পণ্ডিত-গবেষকেরা। প্রশ্ন হতে পারে সেটা কীভাবে সম্ভব। পাঠ একটি, পাঠান্তর অনেক হবে কেন? হয় যে, তার বড়ো দৃষ্টান্ত আমাদের এই আদি গ্রন্থটি। কারণ সেই 'পুঁথি পাঠ'-এ এক-এক জন পাঠকের পাঠ স্বাতন্ত্র্য।

প্রাচীন কালে পুঁথি লিখতে গিয়ে ছাড় চলে যাবার ভয়ে লিপিকরেরা সাধারণত পুঁথির পাতা থেকে কলম ওঠাতেন না, টানা লিখে যেতেন। ফলে পুঁথিতে শব্দ ও পদগুলি পরস্পর মাত্রা দিয়ে জোড়া। পদ্য হলেও প্রতিটি লাইন-এর বিন্যাস টানা গদ্যের মতো। সম্পাদক পুঁথির শব্দ বা পদগুলি যদি পৃথক পৃথক ভাবে যথার্থ রূপে পড়তে না পারেন তাহলে মারাত্মক সংকট দেখা দিতে পারে। তার উপর শব্দগুলি যদি অচেনা বা অপ্রচলিত হয় তো সোনায় সোহাগা। একটি দৃষ্টান্ত নিলে বিষয়টি বোঝা যাবে। চর্যার ৩৩ সংখ্যক পদটির তৃতীয় ছত্রটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুঁথিতে পড়লেন :

ক. *বেঙ্গ সংসার* বড়হিল জাঅ।

সুকুমার সেন পড়লেন :

খ. *বেগ সংসার* বড়হিল জাঅ

প্রবোধ চন্দ্র বাগচী পড়লেন (টীকা অবলম্বনে)

গ. *বেঙ্গস সাপ* বড়হিল জাঅ

শহীদুল্লাহ পড়লেন :

ঘ. *বেঙ্গসঁ সাপ* বড়্হিল জাঅ

চর্যার একটি ছত্রের এই যে চারটি পাঠ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করলেন এবং এর ফলে যে সমস্যা দেখা দিল তার প্রধান কারণ প্রতিটি পদ পরস্পর জুড়ে থাকা। দ্বিতীয় কারণ এক-একজন গবেষকের 'জ্ঞানগম্যি'। অর্থাৎ মূল গানের 'পাঠ'-এ সংশয় থাকায় মুনিদত্ত—এর সংস্কৃত টীকার পাঠ গ্রহণ করেছেন কেউ কেউ।

এই হেঁয়ালি পদটির রচয়িতা হিসাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শহীদুল্লাহ এমনকি সুকুমার সেনও 'ঢেণ্ঢণ' পা বলে গ্রহণ করেছিলেন। নামটি প্রচলিত ছিল দীর্ঘদিন। কিন্তু এই অদ্ভুত নামটি নিয়ে প্রথম থেকেই সংশয়ে ছিলেন গবেষকরা। কেননা এ নামের কোনো অর্থ হয় না এবং বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের নামের যে প্রাচীন তালিকা পাওয়া যায় তাতেও 'ঢেণ্ঢণ' অনুপস্থিত। ব্যাকরণ ও ভাষা বিশেষজ্ঞ ড. নির্মল দাশ চর্যা-পুঁথির পাঠ মেলাতে গিয়ে প্রথম লক্ষ্য করেন চর্যার লিপিকরের হস্তাক্ষরে 'ট' ও 'ঢ'-এর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। এটি পূর্বাচার্য গবেষকদের কোনো ভুল নয়—দুটি

বর্ণের লিপি সাদৃশ্যে তাঁরা 'ট' কে 'ঢ' পড়েছেন। প্রকৃত শব্দটি 'টেণ্টণ'। আর তখনই কবির নামটি অর্থ তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। প্রাচীন সাহিত্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় ও ড. দাশের আবিষ্কারকে জোরালো ভাবে সমর্থন করেন। এ বিষয়ে নির্মল দাশের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন :

> টেণ্টণ<টেংটজন; টেংটা=জুয়ার আড্ডা (দেশী নাম মালা); টেণ্টন=(১) জুয়াড়ি, (২) ধূর্ত, চতুর। এখানে সম্ভবত দ্বিতীয় অর্থটি গ্রাহ্য; কারণ গানটির মধ্যে বেশ চাতুর্যের পরিচয় আছে। 'টেণ্টণপাদ' হয়ত কবির স্বনাম নয়, ছদ্মনাম, কবি হয়ত এই ধরনের চতুর প্রহেলিকা পূর্ণ পদ রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন বলেই তিনি এই ছদ্মনাম নিয়েছিলেন। চর্যাপুথিতে 'ট' ও 'ঢ'-এর লিপি দেখতে একরকম। সেইজন্য শাস্ত্রী প্রমুখ 'ঢেণ্টণ পা' পাঠ নিয়েছেন। 'ঢেণ্টণ' পাঠটি গ্রহণযোগ্য হতো, যদি তার কোন অর্থ থাকত; কিন্তু পদটি অর্থহীন। পক্ষান্তরে টেণ্টণ' কথাটি জুয়াড়ি ও ধূর্ত অর্থে কর্পূরমঞ্জরী, দেশী নামমালা, বর্ণরত্নাকর, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল প্রভৃতি রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক কথ্য বাংলায় 'চতুর' অর্থে 'টেঁটন' ও 'টেঁটিয়া' পদের প্রচলন আছে। প্রকৃতপক্ষে 'টেণ্টণ' কথাটির মূল অর্থ জুয়াড়ি; তার সম্প্রসারিত অর্থ ধূর্ত, কারণ জুয়াড়িরাই তো 'ধূর্ত' হয়। কাজেই 'ঢেণ্টণ'-এর বদলে 'টেণ্টণ' পাঠই গ্রহণযোগ্য।[৮]

সুতরাং সকল পক্ষে কাঙ্ক্ষিত আদর্শ পাঠ কেবল লিপির হুবহু অনুসরণেই গৃহীত হতে পারে না—সেক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বিষয়গুলিও, যেমন অর্থ তাৎপর্য, পঙ্‌ক্তির অন্ত্যমিল প্রভৃতির দিকেও নজর রাখতে হয়।

অর্থ তাৎপর্যে যেমন পুঁথির আদর্শ পাঠ পাওয়া যায়, তেমনি কবিতার অন্ত্যমিল ধরেও পাওয়া সম্ভব। এমনই একটি আদর্শ পাঠের সন্ধান দিয়েছেন প্রাচীন পুঁথি বিষয়ে উৎসাহী রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র মলুয়া পালার শেষদৃশ্যের দুটি ছত্র হল :

কপালে আছিল দুঃখ না যায় খণ্ডনে
কোন দোষের দোষী নয় আমার সোয়ামী।

দীনেশচন্দ্র সেন, সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত উক্ত গ্রন্থ ছাড়াও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গবীণা' (১৯৩৪) সংকলন গ্রন্থে 'মলুয়ার বিদায়' কবিতাতেও (পৃ. ৯২) এই পাঠ পাওয়া যায়। সমগ্র মলুয়া পালাটির বিচারে একমাত্র এই দুটি ছত্রের পাঠে প্রথম ছত্রটির সঙ্গে দ্বিতীয় ছত্রের অন্ত্যমিল নেই। অথচ গোটা পালায় এই একবার ছাড়া আর কোথাও 'মিল'-এর অসংগতি চোখে পড়ে না।

জীবনের প্রান্তসীমায় 'বাংলা ভাষা পরিচয়' (১৩৪৫) লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়ে এই 'পাঠ'-এর গরমিল। এই বই-এর ষোড়শ অধ্যায়ে তির্যক রূপের আলোচনায় প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য থেকে অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তিনি। লিখেছেন, '...'বানরে কলা খায়' বলে থাকি, 'গোপালে সন্দেশ খায়' বলিনে। বাংলায় কোনো কোনো অংশে তাল বলে শুনেছি। ময়মনসিংহ গীতিকায় আছে : কোনো দোষে দোষী নয় আমার সোয়ামী জ'নে।'[৯]

রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কৃত এই পাঠ ধরলে গোটা 'মলুয়া' পালার অন্ত্যমিলের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে দাঁড়ায় :

কপালে আছিল দুঃখ না যায় খণ্ডনে
'কোনো দোষে দোষী নয় আমার সোয়মী জনে।'

রবীন্দ্রনাথ গৃহীত এই পাঠ যে সঠিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের অনুমান পল্লীগাথা ও গীতিকার সংগ্রাহক জসীম উদ্দিনের কাছ থেকে কবি পেয়েছিলেন এই আদর্শ পাঠ।[১০]

তিন

ধন ঘরে লুকায় কালকেতু

অতি প্রচলিত আরও দুটি পাঠ-সমস্যার কথা বলে প্রসঙ্গ শেষ করব। ফিরে যাই কবিকঙ্কণ চণ্ডীর আখেটিক খণ্ডের আখ্যানে। প্রথমেই যে প্রশ্নটি সামনে রাখতে চাই, তা হল কোনো রাজবাড়িতে বা রাজপ্রাসাদে 'ধানের গোলা' থাকা কি সম্ভব? চণ্ডীর কৃপায় যার দ্বারকার মতো পুরী, অফুরন্ত ধনসম্পদ, হাতি-ঘোড়া, তার সাতমহলা প্রাসাদে 'ধান্য ঘর' কি মানায়। এই অসামঞ্জস্য থেকেই কাব্যের প্রাসঙ্গিক অংশের 'পাঠ' সম্পর্কে সিরিয়াস পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, গুজরাট-এর এই রাজা তার বিপুল ধনরত্ন কোথায় রাখবেন? উত্তরটি সহজ। রাজপ্রাসাদের গোপন সুরক্ষিত স্থানে থাকবে তার Strong room—বা ধন-সম্পদের ভাণ্ডার গৃহ। অথচ রাজা কালকেতু কলিঙ্গরাজের সঙ্গে প্রথমবার যুদ্ধে জয়লাভ করেও দ্বিতীয়বার আক্রমণে বিপদ বুঝে ফুল্লরার পরামর্শে কোথায় গিয়ে আত্মগোপন করছেন? শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর বহুল প্রচারিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে আছে :

ফুল্লরার কথা রাখ কতক কাল জীয়া থাক
না যাইহ রাজার সমরে।

ফুল্লরার কথা শুনি হিতাহিত মনে গুণি

লুকাইল বীর *ধান্য-ঘরে।*

পাঠকের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তিতে বিরোধ বাঁধবে এখানেই। কালকেতুর রাজপ্রাসাদে 'ধান্যঘর' অর্থাৎ ধানের গোলা এল কী করে? এই অস্বাভাবিকতা থেকে যে গণ্ডগোল তার বিমোচন ঘটবে পাঠক যখন ড. ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীর আখেটিক খণ্ডের ফুল্লরার উপদেশ অধ্যায়টি পড়বেন :

ফুল্লরার কথা শুনি হিতাহিত মনে গুণি

লুকাইল বীর ধনঘরে।

তখন পাঠকের মনে কোনো সংশয় দেখা দেবে না। অর্থাৎ গুজরাট-রাজ কালকেতু তাঁর প্রাসাদের সবচেয়ে সুরক্ষিত ও গোপন স্থানে গিয়ে লুকিয়ে পড়লেন। সুতরাং পুঁথির আদর্শ পাঠের সন্ধানে প্রথম পাঠ 'ধান্যঘর' নয় দ্বিতীয় পাঠ 'ধনঘর'কেই গ্রহণ করব আমরা। পল্লী বাংলার শিক্ষালোকহীন গ্রাম্য লিপিকরের কাছে 'ধান্যঘর' যত পরিচিত, 'ধনঘর' ততটা নয়। তাই এই লিপিকর প্রমাদ। স্বল্প অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন লিপিকর-এর কাছে ধান্যঘরই কাঙ্ক্ষিত—তাই এই পাঠ-বিভ্রাট। ক্ষুদিরাম দাস পাদটীকায় লিখেছেন, 'ধনঘরে—সুরক্ষিত রাজ অন্তঃপুরেই ধন ঘর। ধান্যঘর পাঠ ভুল।'[১১]

চার

শালুক পোড়ার নৈবেদ্য

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে মুকুন্দের আত্মপরিচয় বা 'গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ' বা 'কবিত্বলাভের ইতিবৃত্ত' অংশের পাঠ-পাঠান্তর নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। সেগুলির বেশিরভাগই কবির আবির্ভাবকাল সম্পর্কিত। আমরা যে পদটির অর্থ অনুসন্ধানের সূত্রে সঠিক পাঠ নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছি সেটি কাব্যে উপস্থাপিত হয়েছে দেবী চণ্ডীর পূজার নৈবেদ্য হিসাবে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণে আছে :

১. আশ্রম পুখরি আড়া নৈবেদ্য *শালুক পোড়া*

পূজা কৈনু কুমুদ-প্রসূনে।

আর ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীর সংস্করণে আছে :

২. আসন পুখরি আড়া নৈবেদ্য *শালুক নাড়া*

পূজা কৈল কুমুদ প্রসূনে।

এখানে অন্যান্য পাঠান্তর নিয়ে তেমন বিতর্ক না থাকলেও সহৃদয় মগ্ন পাঠক প্রশ্ন

তুলতেই পারেন দেবীর নৈবেদ্যর উপকরণটি নিয়ে—'শালুক পোড়া' নাকি 'শালুক নাড়া'? সুকুমার সেন পুঁথিতে 'শালুক নাড়া' পেয়ে নিজের সম্পাদিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মূল পাঠে সেটি বজায় রেখে পাঠান্তরে অন্য পুঁথির পাঠ 'পোড়া' ও 'দাঁড়া'র উল্লেখ করেছেন। চণ্ডীমঙ্গলের বসুমতী সংস্করণে ও পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত সংস্করণেও 'শালুক নাড়া' পাই। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পূর্বে উল্লিখিত পুঁথিতে আছে 'ডাঁড়া'। বঙ্গবাসী সংস্করণে পাই 'পোড়া'।

'শালুক নাড়া' পাঠ যেহেতু অনেকগুলি পুঁথিতে পাওয়া যাচ্ছে, তাই এই পাঠই সঠিক এমন সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে। এখন থেকে তিন দশক পূর্বে যখন কলেজে চণ্ডীমঙ্গল পড়াতে হত সে সময় এই পাঠ সমস্যার কথা ড. ক্ষুদিরাম দাসকে জানিয়েছিলাম। সেই ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তিনি জানিয়েছিলেন 'পোড়া' অশুদ্ধ পাঠ। কেননা দেবতার নৈবেদ্যতে পোড়া জিনিস দেওয়ার চল নেই। বরং খারাপ অর্থে শব্দটি ব্যবহার হয়। যেমন 'কচু পোড়া খাও' ইত্যাদি। আর 'নাড়া' হচ্ছে 'নাল'; 'ডাঁড়া' বা 'দাঁড়া'ও তাই। অর্থাৎ শালুক ফুলটি যার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে বা ফুটে থাকে এবং সেটি যে খাদ্যবস্তু বাজারে গেলেই তা দেখতে পাওয়া যায়। ড. দাসের মতামত সে সময়কার তরুণমন গ্রহণ করতে পারেনি। অবুঝ ভাবনায় যে প্রশ্নটি ঘোরাফেরা করছিল রন্ধন সাপেক্ষ সবজি-বিশেষ সেই 'শালুক নাড়া'ই কি দেবতার নৈবেদ্য হতে পারে?

শালুকের স্পষ্ট তিনটি ভাগ :

১. শালুক/সালুক অর্থাৎ জলজ লতার মূল। জলের তলায় মাটি সংলগ্ন অথবা ভাসমান কন্দকেই বলে সালুক। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সালুক'-এর দুটি অর্থ করেছেন—ক. কুমুদ পুষ্প খ. কুমুদের 'কন্দ' বা 'গেঁড়'।

২. শালুক/সালুকের 'নাল' অর্থাৎ 'নাড়া', 'দাঁড়া' বা ডাঁড়া'। অর্থাৎ ফুলটি যাতে ফুটে থাকে।

৩. শালুক/সালুক ফুল।

দ্বিতীয় পাঠটি সম্পর্কে ড. দাস নিজের সিদ্ধান্তে এতটাই অটল যে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পাঠান্তর নিয়ে একটি প্রবন্ধে বিষয়টি উত্থাপন করে লিখেছেন—'নৈবেদ্য শালুক পোড়া' এ কখনও হতে পারে? পোড়া জিনিস কেউ নৈবেদ্যে দেয়? ভিন্ন পাঠ হল 'গোড়া' ও নাড়া। আমরা দ্বিতীয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ 'শালুক নাড়া'ই গ্রহণ করতে চাই।[২২]

ড. দাস দ্বিতীয় পাঠ হিসাবে শালুক-এর 'গোড়া'র উল্লেখ করেছেন। শালুকের এই 'গোড়া'টি হল জলজ উদ্ভিদের 'কন্দ' বা 'গেঁড়'। পল্লী বাংলার মানুষ জানেন শালুকের 'কন্দ'টি পুড়িয়ে সুস্বাদু হালকা একধরনের ছোটো ছোটো খই তৈরি হয়—তার থেকে

প্রস্তুত হয় মোয়া। দেবতার নৈবেদ্যতে খই। মোয়া দেওয়ার প্রচলন আছে বলেই তা জানি। দামুন্যার কৃষক-কবির[১৩] এটি অজানা থাকার কথাও নয়। সুতরাং অবস্থার বিপাকে পড়ে মুকুন্দের পক্ষে দেবী চণ্ডীকে শালুক ফুল দিয়ে পুজো করা যেমন সম্ভব, তেমনি নৈবেদ্যর ভোগ হিসাবে কাঁচা 'নাল' বা 'নাড়া' অপেক্ষা 'শালুক' পোড়ার খই দেওয়া অসম্ভব নয়। 'নাড়া' অপেক্ষা 'পোড়া' বা 'গোড়া' পাঠ অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলেই মনে করি।

তথ্যসূত্র

১. আমি রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত 'পুঁথি' শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী। এ বিষয়ে কবির মন্তব্য—'পুঁথি শব্দের চন্দ্রবিন্দুর লোপে পূর্ববঙ্গে প্রভাব দেখিতেছি, উহাতে আমার সম্মতি নাই।' দ্র. সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বেদান্ত শাস্ত্রীকে লিখিত পত্র, বাংলা শব্দতত্ত্ব (১৩৯১ সং) পৃ. ২৯৯।

২. দ্র. বাঙ্গালী কবি নয়, ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭ পৃ. ২২৮-২২৯

৩. দ্র. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য : যতেক যুবতী পুরবাসী বন্ধুজন দ্র. বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল : বীক্ষণ ও সমীক্ষা (২০১৪) পৃ. ৫০০-৫১৯

৪. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য মৎলিখিত প্রবন্ধ 'রবীন্দ্র-ভাবনায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল' : পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ৮১৫-৮৪৮

৫. ড. ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী (১৯৮৭ সং) পৃ. ২০৭

৬. ড. নীলরতন সেন সম্পাদিত চর্যাগীতি কোষ (ফটোমুদ্রণ সং) ১৯৭৮

৭. নেপালে প্রাপ্ত চর্যাগীতির প্রথম পৃষ্ঠাতেই নাগরী হরফে কালো কালি দিয়ে বড়ো হরফে পুঁথির নাম লেখা 'চর্য্যাচর্য্যটীকা'।

৮. ড. নির্মল দাশ সম্পাদিত চর্যাগীতি পরিক্রমা (১৩৮৮ সং) পৃ. ১৭৮-১৭৯

৯. দ্র. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত ময়মনসিংহ গীতিকা (৩য় সং) পৃ. ৯৯

১০. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য মৎ লিখিত প্রবন্ধ 'ময়মনসিংহের গীতিকা সম্পদ : রবীন্দ্র দৃষ্টিতে মৎলিখিত' গ্রন্থ পাঠক রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি থেকে ভারতচন্দ্র (২০১১) পৃ. ২৪৩-২৪৯

১১. দ্র. ড. ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত পূর্বোক্ত কবিকঙ্কণ চণ্ডী পৃ. ২৩৪

১২. ড. ক্ষুদিরাম দাস : কবিঙ্কণের কাব্যের পাঠ ভেদ-চিন্তা; দ্র-বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ৮১৩

১৩. 'গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ' অধ্যায়ে মুকুন্দ আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—'দামিন্যায় চাষ চষি'।

স্বীকৃতি : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে 'পুঁথি পাঠ ও সম্পাদনা'র দুদিনের কর্মশালায় সমাপ্তি ভাষণ (২৫ আগস্ট, ২০০৭)।